গণেশ দিয়ে শুরু

নববর্ষে গণেশের সঙ্গে পরিচয়। সেই সূত্রে তাঁর 'আত্মীয়'দেরও আনলেন

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
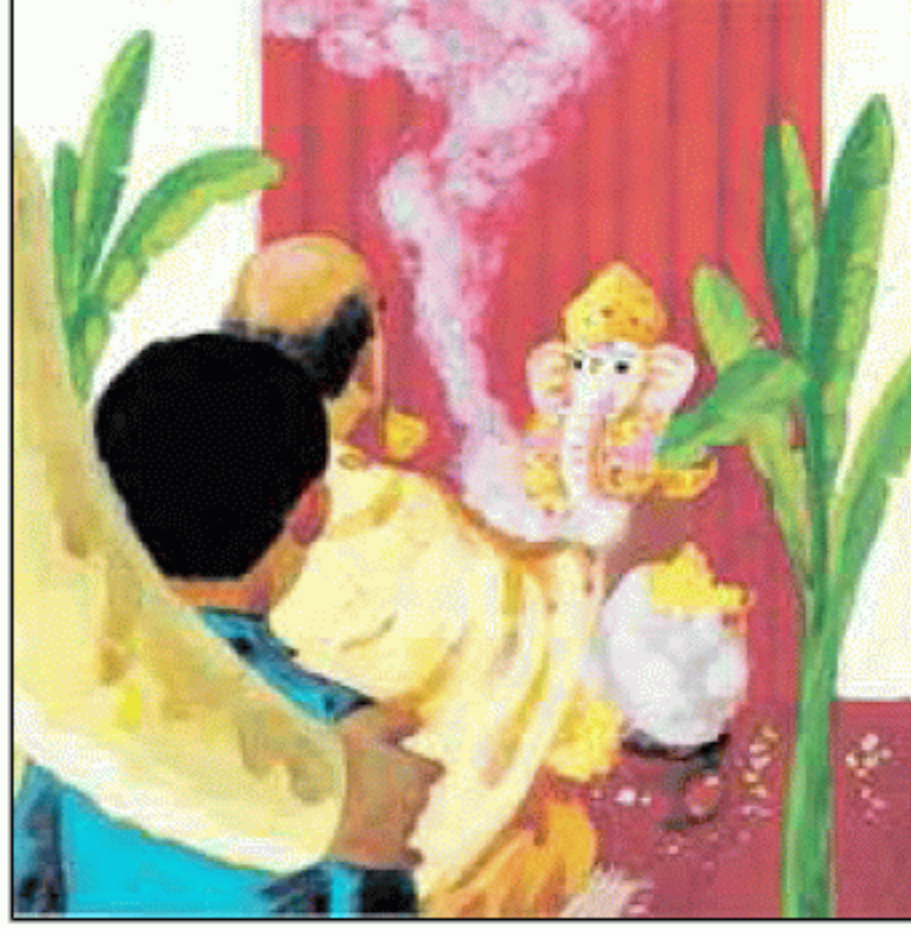
ছেলেবেলায় বাবার সঙ্গে পয়লা বৈশাখের দিন কয়েকটি দোকানে যেতাম হালখাতার আমন্ত্রণে। বেশ ভাল ভাল মিষ্টদ্রব্য খাওয়া যেত। সব দোকানেই দেখতাম একটি গণেশমূর্তি ফুল মালা দিয়ে সাজিয়ে পুজো করা হয়েছে। হিন্দু দেবদেবীরা সবাই খুব সুন্দর এবং চিরযৌবনময়, একমাত্র ব্যতিক্রম গণেশ, যাঁর নিজস্ব মুখশ্রী নেই, হাতির সঙ্গে মিলিয়ে তাঁর চেহারাটাও বেশ নাদুশনুদুশ। আমার বেশ পছন্দ ছিল। একটু বড় হবার পর মিষ্টি খাবার প্রলোভন আমার একেবারেই চলে যায়, টক ঝালে বেশি স্বাদ পাই। বিনা পয়সায় পেলেও মিষ্টি খেতে ইচ্ছে করে না, তাই হালখাতাতেও যাই না।

কিন্তু, গণেশ সম্পর্কে কৌতূহল জাগে। এত দেবদেবী থাকতে গণেশ কী করে এই রাজ্যের ব্যবসা বাণিজ্যের হিন্দু কর্তাদের আরাধ্য হলেন? পুরাণ টুরানে তো গণেশের সে রকম কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না! ইনি যুদ্ধবিদ্যা ভাল জানেন না। পরশুরামের সঙ্গে এক বার লড়াই করতে গিয়ে একটা দাঁত খুইয়েছেন। বরং নাচতে এবং মদ্যপান করতে ভালবাসেন।

বেশ কয়েক জায়গার প্রাচীন মূর্তিতে গণেশ তাঁর শুঁড় দিয়ে মদ্য অথবা মোদক পানে নিরত। লেখাপড়াও বেশ ভালই জানেন, অত বড় মহাভারতের শ্রুতিলিখন করা তো সহজ কর্ম নয়! তাও মাঝে মধ্যে ব্যাসদেব এক একখানা শ্লোক অতি জটিল ও দুর্বোধ্য করে দিলেও গণেশ তৎক্ষণাৎ তার অর্থ বলে দিতেন। এ সব তাঁকে মানায়। কিন্তু, ধনরত্নের দেবী লক্ষ্মীর পক্ষেই ব্যবসায়ীদের উপাস্য হওয়া স্বাভাবিক ছিল, গণেশ তাঁর কাছ থেকে কী করে এই পদটা ছিনিয়ে নিলেন?

অত বড় দেবতার বাহন একটা ইঁদুর। যেমন, অমন রূপসী লক্ষ্মীদেবীর বাহন একটা প্যাঁচা! এতে যেন ঔচিত্যবোধের খুবই অভাব। এই সব বাহনের রূপকার্থ নিয়ে নানা রকম ব্যাখ্যা তো হতেই পারে। লক্ষ্মীমূর্তির বিবর্তনের ইতিহাসে দেখা যায়, নানা সময়ে তাঁর বাহন ছিল ময়ূর, কূর্ম, সিংহ

এবং হাঁস। কোনওটাকেই তিনি ধরে রাখতে পারেননি। দিদির হাঁসই নিয়ে নেওয়ার খুবই চেষ্টা করেছিলেন, পারেননি। শেষ পর্যন্ত জুটল প্যাঁচা! এই প্যাঁচা সম্পর্কে পণ্ডিতদের একটি মত আছে। বিষ্ণুর বাহন গরুড়, আর বিষ্ণুপ্রিয়ার বাহন সেই গরুড়েরই ক্ষুদ্র সংস্করণ প্যাঁচা। প্যাঁচার মুখের সঙ্গে গরুড়ের খানিকটা মিল আছে, ঠিকই। তা হলে, গণেশ বাহন ইঁদুরও হতে পারে হাতির অতি ক্ষুদ্র বংশধর। সেই যে গল্পে আছে, হবুচন্দ্র রাজা জীবনে কোনও দিন শুয়োর দেখেননি, প্রথম ওই প্রাণীটি দেখে তিনি মন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, মন্ত্রী, ওটা কী? মন্ত্রীদের সবজান্তা হতেই হয়। তিনিও আগে কখনও শূকর দর্শন করেননি, তবু চটপট উত্তর দিলেন, মহার াজ, খুব সম্ভবত ওটা একটা হাতি, শুঁড়টুড় ক্ষইয়ে ফেলে ছোট হয়ে গেছে, কিংবা একটা ইঁদুর অনেক বড় হয়ে উঠেছে! (গজক্ষয় অথবা মূষিক বৃদ্ধি)।

আমাদের এখানে পয়লা বৈশাখে গণেশ পুজো হলেও সারা বছর আর তেমন মাতামাতি নেই ওঁকে নিয়ে। মহারাষ্ট্রে গণেশের নামে বিরাট উৎসব হয়। গণেশক্ষেত্র নামে একটি পাহাড়ও আছে। আগে জানতাম, মরাঠিদের সামনে গণেশকে নিয়ে কোনও ঠাট্টা ইয়ার্কি করা চলে না। বিজয় তেন্ডুলকর একটি নাটকে দুঃসাহসের সঙ্গে তাও করেছেন দেখলাম। অনেক বাড়ির প্রধান ফটকের ওপরে একটা কুলুঙ্গিতে গণেশমূর্তি রাখা থাকে। লোকপ্রসিদ্ধি এই, ওই মূর্তি প্রতিষ্ঠিত থাকলে সে গৃহে কোনও অমঙ্গল প্রবেশ করতে পারে না। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে বিনায়কদার কথা।

আমাদের ছাত্র বয়সে বিনায়ক দাশগুপ্ত ছিলেন অর্থনীতির প্রসিদ্ধ অধ্যাপক। তিনি প্রত্যক্ষ র াজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। তবে, মার্কসবাদে দৃঢ় বিশ্বাসী এবং নিদারুণ নাস্তিক। তিনি আ মাদের অনেককে নাস্তিকতায় দীক্ষা দিয়েছিলেন। তার পর বহু দিন কেটে গেছে, সেই সব ছাত্ররা এখনকার ছাত্রদের বাবা। বিনায়কদার বয়েস হয়েছে, মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই। এর মধ্যে এক দিন গিয়ে দেখি, ওঁদের ফ্ল্যাটের দরজার ওপরে একটি গণেশমূর্তি।

মুখে কিছু বলিনি, আমার কৌতূহলী দৃষ্টি অনুসরণ করে বিনায়কদা খানিকটা অপ্রস্তুত ভাবে বললেন, বড় ছেলেটা দক্ষিণ ভারত থেকে নিয়ে এসেছে, ভারী সুন্দর, ওয়ার্ক অফ আর্ট। বিনায়কদার বসবার ঘরে একটা বড় কাচের আলমারিতে অনেক মূর্তি ও শিল্পকলার নিদর্শন সাজানো আছে, গণেশটি সেই আলমারি ছেড়ে দরজার ওপরে শোভা পাচ্ছে কেন? এই প্রশ্নও মনে এসেছিল, মুখ ফুটে বলিনি। তার পরই মনে পড়ল, বিনায়ক তো গণেশেরই আর একটি না ম। সেই জন্যেই এই দুর্বলতা?

হিন্দুদের না কি তেত্রিশ কোটি দেবতা। একটু বাড়াবাড়ি মনে হয় না? আমাদের পুরাণ মহাকাব্যে,

কথায় কথায় লক্ষ কোটি, স্বল্প সংখ্যায় সুখ হয় না। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে সৈন্য সংখ্যার যে হিসেব আছে, অত মানুষের পক্ষে ওই মাঠটায় পা রাখাই অসম্ভব। মুর্শিদাবাদের এক গ্রামের র াজবাড়িতে তেত্রিশ কোটি দেবতার মন্দির আছে, এই শুনে দেখতে গিয়েছিলাম। ছোট ছোট মোট তেত্রিশটি গেরুয়া রঙের মন্দির, অধিকাংশ মূর্তিই চেনা যায় না।

আমি মোট দশ বারোটি দেব দেবীর নাম জানি। প্রধান তিন দেবতার মধ্যে ব্রহ্মা একেবারেই জনপ্রিয় নন। শিব আর বিষ্ণুর মধ্যে চলে খ্যাতির প্রতিযোগিতা। আর, দুর্গাপুজোর সুবাদে খুবই পরিচিত, একই পটে দুর্গার সঙ্গে লক্ষ্মী সরস্বতী, কার্তিক গণেশ। ওপরের দিকে কখনও কখনও ছোট্ট করে শিবের মূর্তিও থাকে। একই চালচিত্রে এতগুলি দেবতার মূর্তি আর কোথাও আছে কি? বাঙালি হিন্দুরা কী করে এদের মিলিয়ে দিল?

প্রচলিত ধারণা আছে যে, এ যেন শিব দুর্গার সংসার, দু'পাশে তাঁদের চারটি ছেলেমেয়ে! এ ধার ণা সম্পূর্ণ ভুল। ওই চার জন মোটেই পরস্পরের ভাই বোন নন। আর, দুর্গার পক্ষেও কোনও সন্তানের জন্ম দেওয়ার সময় ছিল না।

সরস্বতী কী করে দুর্গার মেয়ে হবেন? তিনি তো দুর্গার চেয়েও বয়সে বড়। এ যেন সেই বাউল গানের মতন, 'মেয়ের পেটে মায়ের জন্ম, আমরা ভেবে করব কী'। সরস্বতীর দেখা পাই আমরা আমাদের সভ্যতার উষা লগ্নে, যখন ঋক বেদ রচিত হচ্ছে। তখন যজ্ঞের সময় এক সঙ্গে তিন দেবীকে আহ্বান করা হত। ইলা, ভারতী ও সরস্বতী। এঁরা প্রথমে আলাদা ছিলেন, এক সময় ইলা (ইড়া) কোথায় যেন হারিয়ে গেলেন, আর, ভারতীও ক্রমশ মিশে গেলেন সরস্বতীর সঙ্গে।

সরস্বতী দেবী আবার নদীরূপাও বটে। নামের অর্থেই তার পরিচয়। অবশ্য 'সরস' শব্দের অন্য অর্থ জ্যোতি, অর্থাৎ তিনি জ্যোতির্ময়ী। ক্রমে নদীরূপটিই প্রাধান্য পায়। সে কালে গঙ্গার উল্লেখ খুবই কম, আর্য সভ্যতায় সিন্ধু এবং সরস্বতীই দুই প্রধান নদী। সরস্বতীর তীরে বহু যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হত। প্রসিদ্ধ রাজারা এর দু'তীরে বাস করতেন। গড়ে উঠেছিল বহু নগর ও তীর্থস্থান। এক সময়ে কোনও অজ্ঞাত কারণে এই সরস্বতী নদী অন্তর্হিত হয়ে যায়। রাজস্থানের মরুভূমিতে ডুব দেয়। সেই স্থানটির নাম বিনশন। তার পরেও এখানে সেখানে সরস্বতীর কিছু চিহ্ন দেখা গেছে বটে, কিন্তু নদীর বদলে সরস্বতীর দেবীরূপ স্পষ্টতর হয়। তখন তিনি ছিলেন ধনদাত্রী, অন্নদাত্রী। 'দানশালিনী অন্নসম্পন্না স্তোতৃবর্গের রক্ষাকারিণী সরস্বতী যেন অন্নদ্বারা সম্যক রূপে আমাদের তৃপ্তি সাধন করেন।'

সব দেব দেবীরই বিভিন্ন যুগে নানা বিবর্তন হয়েছে। ঋষিরা তো এক জায়গায় বসে, কমিটি গঠন করে দেব দেবীদের নির্দিষ্ট রূপ ও গুণাবলির কথা রচনা করেননি। নানা জনে আলাদা আলাদা ভাবে ইচ্ছে মতন শ্লোক লিখেছেন। যুগ যুগ ধরে সেই সব পৃথক

ভাবমূর্তি একটি মিলিত রূপ পেয়েছে। আজকের যে সরস্বতীকে বাক্ দেবী বলে মনে করা হয়, আদি যুগে তিনি তা ছিলেন না। নদী রূপে তিনি মানুষের অন্ন ও সম্পদবৃদ্ধির জন্য আরাধ্যা। আবার, দেবী রূপে তিনি যুদ্ধও করেছেন দানবদের বিরুদ্ধে। তখনও লক্ষ্মীও আসেননি, দুর্গাও আসেননি। এঁদের দু'জনের ভূমিকাও সরস্বতীকে কিছুটা পালন করতে হয়েছিল।

সরস্বতীর নানান গুণের কথা বলা হলেও তাঁর মূর্তি স্পষ্ট ছিল না। শুধু বলা হত তিনি শুভ্রবর্ণা। এক যুগ পরে বলা হল সত্য ও মিথ্যা বাক্য সরস্বতীর দুটি স্তন। বাক্ দেবী সরস্বতীর একটি অপূর্ব সুন্দর বর্ণনা আছে রাজশেখরের কাব্য মীমাংসায়। সেটি উদ্ধারযোগ্য। 'সরস্বতী পুত্র কামনা করে তুষার পর্বতে তপস্যা করছিলেন। তপস্যায় তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা তাঁকে বললেন, তোমায় পুত্র দান কর ব। এক সন্তানের জন্ম হল, তার নাম কাব্য (কাব্যপুরুষ), তাঁর শরীর শব্দ ও অর্থ দিয়ে গঠিত। সংস্কৃত ভাষা তাঁর মুখ, প্রাকৃত ভাষা তাঁর বাহু, অপভ্রংশ ভাষা জঘনদেশ, পৈশাচী ভাষা তাঁর পদদ্বয় এবং উরু মিত্র ভাষা।... রস তাঁর আত্মা, রোম তাঁর ছন্দ... অনুপ্রাসাদি তাঁর অলঙ্কার।'

কালপ্রবাহে সরস্বতীর জন্ম সম্পর্কেও বিভিন্ন গল্প প্রচলিত হয়েছে। কোনও পুরাণে তিনি ব্রহ্মার কন্যা; ব্রহ্মার মুখ থেকে নির্গত হয়েছিলেন। জন্মমাত্রই যুবতী, এই কন্যার রূপ দেখে কামমোহিত ব্রহ্মা তাঁর মিলন চান। ব্রহ্মার পুত্ররা এ জন্য ছি ছি করায় ব্রহ্মা শেষ পর্যন্ত অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়ে আত্মহত্যাই করে বসলেন। আবার, কোথাও সরস্বতীকে বলা হয়েছে পরমেষ্ঠিনী। ব্রহ্মার অপর নাম পরমেষ্ঠী, অর্থাৎ, সরস্বতী ব্রহ্মার পত্নী। আর একটি শ্লোকে সরস্বতী বিষ্ণুর অর্ধাঙ্গিনী। এবং সরস্বতী শিবেরও স্ত্রী, এমন উল্লেখও আছে। অর্থাৎ, প্রধান তিন দেবতার সঙ্গেই তাঁর সম্পর্ক আছে। আগেই বলা হয়েছে, নানা মুনির নানা মত। তবে, বাঙালিরা কী করে এই সরস্বতীকে শিব দুর্গার কন্যা বানিয়ে ফেললে, তার ব্যাখ্যা মেলা ভার।

লক্ষ্মীর আগমন আর একটু পরে। অনেকেরই ধারণা, সমুদ্রমন্থনের সময় উঠে আসেন লক্ষ্মী। কিন্তু, লক্ষ্মী সমুদ্রের অতলে রইলেন কী করে? এ সম্পর্কেও একটা কাহিনি আছে। দুর্বাসা মুনি, যিনি শুধু অভিশাপ দেবার জন্যই বিখ্যাত, তাঁর অন্য কোনও গুণপনার কথা বিশেষ জানা যায় না, তিনি এক দিন একটা ফুলের মালা উপহার দিলেন ইন্দ্রকে। ইন্দ্র অমন ফুলের মালা অনেক পেয়েছেন, তিনি অন্যমনস্ক ভাবে মালাটি রেখে দিলেন ঐরাবতের মস্তকে। ঐরাবতের বোধহয় মালাটি পছন্দ হয়নি, মাথা ঝাঁকিয়ে সেটা সে ফেলে দিল মাটিতে। তার পর পা দিয়ে চেপ্টে দিল। ব্যস! কোপন স্বভাব ঋষি অমনি জ্বলে উঠে উচ্চারণ করলেন অভিশাপ। অদ্ভুত সেই অভিশাপ। তিনি বললেন, কী! আমার দেওয়া মালা মাটিতে ফেলে দিলে, তাই তোমার ত্রিলোক এখন লক্ষ্মীছাড়া হবে। অর্থাৎ, লক্ষ্মীর নির্বাসন। দোষ কর লেন ইন্দ্র, শাস্তি পেতে হবে লক্ষ্মীকে। সাধে কি আর নারীবাদীরা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের ওপর এত ক্ষিপ্ত! লক্ষ্মীকে লুকোতে হল সমুদ্রে।

পরে দেবতাদের ব্যাকুল প্রার্থনায় বিষ্ণু পরামর্শ দিলেন সমুদ্র মন্থনের। মন্থনের পর যিনি রত্নাকর থেকে উত্থিতা হলেন, তিনি কিন্তু লক্ষ্মী নন। সেই দেবীর নাম শ্রী। এই শ্রী ও লক্ষ্মী দুই পৃথক দেবী ছিলেন। বেশ কিছু কাল পরে দুজনে মিলেমিশে এক হয়ে যান। লক্ষ্মী দেবী ছিলেন মহর্ষি ভৃগুর কন্যা, মায়ের নাম খ্যাতি। লক্ষ্মী ও শ্রী একাকার হয়ে বিষ্ণুর পত্নী হন। সেই লক্ষ্মীই কী করে ইন্দ্রের পাশে থাকেন? এ সবই দেব দেবীদের ধারণার নানা রকম বিবর্তনের ফল।

দুর্গা তো কারও জননী হতেই পারেন না। কয়েকটি পুরাণ মতে, তিনি শিবের স্ত্রীও নন। মহিষাসুর নামে অসুরকে ব্রহ্মা বর দিয়ে ফেলেছিলেন যে, কোনও পুরুষ তাকে বধ করতে পারবে না। এর পর সে মনের আনন্দে দেবতাদের ওপর অত্যাচার শুরু করল। উত্ত্যক্ত, ব্যতিব্যস্ত দেবতারা দেখলেন, এর একটা হেস্তনেস্ত করা দরকার। তাঁরা নিজেরা কেউ এই দানবের সঙ্গে লড়তে পারবেন না, এক প্রবল শক্তিশালিনী নারীকে সৃষ্টি করতে হবে। তখন অনেকেই তাঁদের তেজের অংশ দান করলেন। শিবের তেজে হল মুখ, বিষ্ণুর তেজে দশটি বাহু, চন্দ্রের তেজে দুই স্তন, ইন্দ্রের তেজে কোমর, বরুণের তেজে জঙ্ঘা ও উরু, পৃথিবীর তেজে নিতম্ব, ব্রহ্মার তেজে পদযুগল, বসুগণের তেজে আঙুল, কুবেরের তেজে নাক, প্রজাপতির তেজে দাঁত, সন্ধ্যার তেজে দুই ভুরু ও পবনের তেজে দুই কান। এই গঠন প্রক্রিয়ায় বেশ একটা কৌতূহলী দিক আছে। শিবের তেজে এল রমণীটির মুখ, অথচ সেই মুখে ভুরু ও কান ছিল না? বিষ্ণু দিলেন দশটা হাত, তাতে আঙুল জোড়া হল পরে? এ যেন কুমোরটুলিতে প্রতিমা গড়া! অবশ্য, বিভিন্ন পুরাণে এর পাঠান্তর আছে। যাই হোক, হিমালয় থেকে একটা সিংহ নিয়ে (সিংহ অবশ্য পাহাড়ি পশু নয়) দেবী গেলেন দানব দলনে। এই দেবীরই অন্য নাম চণ্ডী ও কাত্যায়নী। কোনও কোনও অঞ্চলে কাত্যায়নী নামটিই বেশি জনপ্রিয়, বাংলায় দুর্গা। কাজ শেষ হলে এই দেবী দেবতাদের বললেন, আমি ফিরে আসব, তার পর শিবের পাদমূলে মিলিয়ে গেলেন। ফিরে আর আসেননি।

দেবী দুর্গার সেই রণরঙ্গিনী মূর্তি, তার সঙ্গে আর চার জন দেবতাকে জুড়ে দিয়ে যে পূজা, তা-ই বাঙালি হিন্দুদের কাছে কী করে প্রধান উৎসব হয়ে দাঁড়াল, তার উত্তর পাওয়া দুষ্কর। বাংলার কাব্য গানে কিন্তু হিমালয় দুহিতা উমা বা পার্বতীরই প্রাধান্য। পতিনিন্দায় অপমানিতা সতী প্রাণত্যাগ করে হিমালয়ের কন্যা হিসেবে জন্মগ্রহণ করে শিবকেই আবার স্বামী হিসেবে পাবার জন্য দুস্তর তপস্যা করেন (নির্জলা উপবাস, কোনও গাছের পাতাও খেতেন না, তাই তাঁর আর এক নাম অপর্ণা)। আমাদের আগমনী গানে থাকে, 'যাও যাও গিরি, আনিতে গৌরী, উমা কত মা মা বলে কেঁদেছে'। এ যেন বাংলারই মেয়ে। কিন্তু, উমা বা পার্বতীর মূর্তি গড়িয়ে পুজো করা হয় না। যুদ্ধবিদ্যায় বাঙালি হিন্দুর তেমন খ্যাতি নেই, তবু তাঁরা দুর্গা এবং কালীর সংহার মূর্তির বেশি ভক্ত।

লেখাটা শুরু করেছিলাম নাস্তিক বিনায়কদার (নাম বদল করা হয়েছে) গণেশ প্রীতি উপলক্ষে। তার পর অনেক দেব দেবীর প্রসঙ্গ এসে গেল। হিন্দু দেব দেবীদের বিবর্তনের ইতিহাস, একের সঙ্গে অন্যদের মিশে যাওয়া ইতিহাসের দিক থেকে খুবই আকর্ষণীয়, কিন্তু সেটা আমার বিষয় নয়।

তবে, আর একটি ঘটনা লেখার অদম্য ইচ্ছে হচ্ছে। ভলতেয়ার বলেছিলেন, পৃথিবীতে যত দিন দারিদ্র্য থাকবে, তত দিন ধর্মকে একেবারে মুছে ফেলা যাবে না। দরিদ্র, অত্যাচারিত, অসহায় মানুষ যখন মনে করে তাকে সাহায্য করার আর কেউ নেই, কেউ তার পাশে দাঁড়াবে না, তখন সে মনে করে, আর কেউ না থাকুক, ঈশ্বর আছেন। সে ঈশ্বরকে আঁকড়ে ধরে শান্তি পায়। আর, দরিদ্র মানুষদের এই দুর্বলতা দেখে দেশের উচ্চ স্তরের মানুষ, যারা ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মের ধার ধারে না, যারা ক্ষমতালোভী, তারা ধর্মের নানা রকম বিকৃতি ঘটিয়ে দাঙ্গা হাঙ্গামা বাধায়। কথাটা আমাদের মতন দেশে এখনও অনেকটা সত্য। তবু, এক এক জনের ব্যবহারের ব্যাখ্যা কিছুতেই পাওয়া যায় না।

এক নেমন্তন্ন বাড়িতে শান্তা রায়চৌধুরীর সঙ্গে (নাম পরিবর্তিত) দেখা। প্রত্যেক দেশেই সমাজের এক শ্রেণির কিছু নারী ও পুরুষ থাকেন, যাঁদের সব রকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রথম সারিতে চোখে পড়ে। ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল, মিউজিক কনফারেন্স, বিখ্যাত নাটকের উদ্বোধন, বইয়ের উদ্বোধনে শান্তা রায়চৌধুরীর উপস্থিতি অবধারিত। ইংরাজি বাংলায় চমৎকার কথা বলতে পারেন, রূপসী এবং ভ্রূ ভঙ্গিতে ঝিলিক আছে, নাচতেও পারেন পার্টিতে। সেই শান্তা রায়চৌধুরী নেমন্তন্ন বাড়িতে গৃহকর্তাকে মৃদু ধমক দিয়ে বললেন, ইস, আজই গলদা চিংড়ি করেছেন! যাঃ, তারিখটা বদলাতে পারলেন না?

ব্যাপারটা কী? শ্রীমতী রায়চৌধুরী গলদা চিংড়ি খুবই পছন্দ করেন। কিন্তু সে দিন তিনি খাবেন না। সে দিন তিনি কোনও আমিষই খাবেন না। কারণ, সে দিন শুক্রবার, সে দিন তিনি সন্তোষী মায়ের ব্রত পালন করেন। আমিষ তো চলবেই না, কোনও রকম টক খাওয়াও নিষিদ্ধ। শ্রীমতী রায়চৌধুরী বেশ সম্পন্ন পরিবারের বধূ, কোনও রকম অভাব নেই, ভোটেও দাঁড়াবেন বলে শুনিনি, তবু কেন তাঁকে সন্তোষী মা নামের এক হিন্দি সিনেমার দেবীর শরণ নিতে হয়, যাঁর ব্রতে টক খাওয়াও চলে না! ভক্তি মার্গের এ এক জটিল ধাঁধা।